## কিশোর মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র

# আমার বন্ধু রাশেদ

মাসুম আওয়াল

*মুক্তিযুদ্ধে বড়দের পাশাপাশি ছোটদের ভূমিকাও অনেক। ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশের ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের নানা শ্রেণির মানুষ। ৯ মাস লড়াই শেষে বাংলাদেশের আকাশে উড়েছে লাল সবুজের স্বাধীন পতাকা। সেই সময় কিশোর মুক্তিযোদ্ধাদের নাম হয়েছিলো বিচ্ছু। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আশ্রয় করে অনেক চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছে। বিশেষভাবে কিশোর মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে রেখে চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছে কম। কিশোর মুক্তিযোদ্ধাদের কাহিনি নিয়ে যেসব চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি **'আমার বন্ধু রাশেদ'**। রঙবেরঙ এর ধারাবাহিক আয়োজনে এবার আমরা আলো ফেলার চেষ্টা করবো এই চলচ্চিত্রটির উপর।*

- ১৯৫৭ সালে ১ ডিসেম্বর পুরান ঢাকার লালবাগের উর্দু রোডে জন্মগ্রহণ করেন মোরশেদুল ইসলাম।
- ১৯৮৪ সালে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'আগামী' পরিচালনার মাধ্যমে চলচ্চিত্রাঙ্গনে যাত্রা করেন মোরশেদুল ইসলাম।
- ২০১১ সালে মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মাণ করেন 'আমার বন্ধু রাশেদ' সিনেমা।

### মুক্তির আলোয়

সিনেমাটি অনেকেই দেখেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত চলচ্চিত্র 'আমার বন্ধু রাশেদ'। ২০১১ সালে ১ এপ্রিল দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল সিনেমাটি। মুহম্মদ জাফর ইকবালের কিশোর উপন্যাস অবলম্বনে সরকারি অনুদানে সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন 'দীপু নাম্বার টু' খ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা মোরশেদুল ইসলাম। চলচ্চিত্রটি প্রযোজনা করেছে মনন চলচ্চিত্র ও ইমপ্রেস টেলিফিল্ম। চলচ্চিত্রটির সংগীত পরিচালনা করেছেন ইমন সাহা।

### কী আছে সিনেমায়?

সিনেমাটির বিশেষ চরিত্রগুলো হচ্ছে কয়েকজন স্কুল ছাত্র। পর্দায় দেখা যায় রাশেদ নামের একটি ছেলে হঠাৎ স্কুলে হাজির হয়। স্কুলের একজন শিক্ষক মজার ছলেই রাশেদের নাম বদল করে লাড্ডু রেখে দেন। রাশেদকে স্কুলে অনেকে লাড্ডু বলেও ডাকে। সিনেমাটিতে আরও দেখা যায়, একাত্তরের উত্তাল দিনগুলো যখন ছোট ছোট ছেলেরা বুঝতে পারছে না, রাজনীতিসচেতন রাশেদ তখন ঠিক তার মতো করে সেটা সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। সেটা সবার মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে। একসময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দেশটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং একদিন এই ছোট শহরেও তারা এসে হাজির হয়। ভয়ংকর এক ধ্বংসলীলার সাক্ষী হয়ে থাকে রাশেদ। স্বাধীনতাসংগ্রামের শুরুতে মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে সে। সঙ্গে কয়েকজন বন্ধু। সম্মুখযুদ্ধে বন্দী হয়ে যায় তাদের পরিচিত একজন মুক্তিযোদ্ধা। নাম শফিক। একদিন রাশেদ ও তার বন্ধুরা তাকে মুক্ত করে নিয়ে আসে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। কিন্তু যুদ্ধের ডামাডোলে রাশেদ ও তার বন্ধুদের একসময় বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হয়। রাশেদ আরও গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে যুদ্ধে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সব বন্ধু যখন আবার একত্র হয় ছোট্ট শহরটিতে, তারা আবিষ্কার করে রাশেদ নামের বিচিত্র ছেলেটি আর নেই। কিন্তু রাশেদ বেঁচে থাকে তার বন্ধুদের হৃদয়ে।

## যাদের অভিনয়ে আলোকিত

চলচ্চিত্রটিতে রাশেদ চরিত্রটিতে অভিনয় করেছেন চৌধুরী জাওয়াতা আফনান। বড় ইবু চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাইসুল ইসলাম আসাদ। ইবুর বাবা ও ইবুর মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন যথাক্রমে পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ওয়াহিদা মল্লিক জলি। গাজী রাকায়েত অভিনয় করেছেন রাজাকার আজরফ আলী চরিত্রে। ইবু চরিত্রে অভিনয় করেছেন রায়ান ইবতেশাম চৌধুরী। স্কুল শিক্ষকের ভূমিকায় দেখা যায় ইনামুল হককে। আরমান পারভেজ মুরাদ অভিনয় করেছেন শফিক ভাই চরিত্রে। হুমায়রা হিমু অভিনয় করেন অরু আপা চরিত্রে। এছাড়া সিনেমাটিতে আরও অভিনয় করেছেন রাফায়েত জিন্নাত কাওসার আবেদীন, কাজী রায়হান রাব্বি, লিখন রাহি, ফাইয়াজ বিন জিয়া, রাফায়েত জিন্নাত প্রমুখ।

## যা বললেন মুহম্মদ জাফর ইকবাল

আমার বন্ধু রাশেদ বইটি যখন লিখি, তখন আমি আমেরিকায়, দেশে আসব আসব করছি। দীর্ঘদিন থেকে সেই দেশে পড়ে আছি, প্রায় ১৮ বছর, কিন্তু লেখালেখি হয়েছে খুব কম। তার কারণও আছে। আমি একরকম পাণ্ডুলিপি পাঠাই, অন্যরকম বই হিসেবে বের হয়ে আসে। একবার একটা বই ছাপা হয়ে এল, দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম! আমার লেখার পুরো স্টাইল পাল্টে দেওয়া হয়েছে। পড়ে মনে হয় আমি লিখিনি, অন্য কেউ লিখেছে। দেশে প্রকাশককে ফোন করে কারণ জানতে চাইলাম। তিনি লেখালেখির সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে আমাকে জ্ঞান দিয়ে বিশাল একটা চিঠি লিখলেন। অনেক কষ্ট করে পরে আমি অন্য একজন প্রকাশক দিয়ে আমার স্বল্প জ্ঞানের বইটি আমার মতো করে লেখা হিসেবে বের করতে পেরেছিলাম। এর মধ্যে একদিন নিউ ইয়র্কে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি তখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আন্দোলন করে আমাদের সবার প্রিয় একজন মানুষ। আমি একদিন খুব কুণ্ঠিতভাবে হুমায়ূন আহমেদের ভাই হিসেবে পরিচিত হতে গেলাম। দেখি, তিনি আমার যৎসামান্য লেখা দিয়েই আমাকে আলাদাভাবে চেনেন। শুধু তা-ই না, শহীদ জননী আমার লেখালেখি নিয়ে খুব দয়ার্দ্র কিছু কথা বললেন। তখন হঠাৎ করে আমার আবার লেখালেখির জন্য একটা উৎসাহ হলো; এক ধাক্কায় দুই দুইটা বই লিখে ফেললাম। তার একটি হচ্ছে 'আমার বন্ধু রাশেদ'। এটা মুক্তিযুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে লেখা একটা কিশোর উপন্যাস। এটা লেখার সময় আমি চেষ্টা করেছি সেই সময়ের ধারাবাহিকতাটুকু রাখতে। মুক্তিযুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষ কিসের ভেতর দিয়ে গেছে, সেই ধারণাটাও একটু দিতে চেষ্টা করেছি। এমনিতে আমার কিশোর উপন্যাসের একটা ফর্মুলা আছে, সব সময়ই সেখানে একটা অ্যাডভেঞ্চার থাকে। আর তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমি আমার ছোট ছোট পাঠকের মনে কখনো কোনো কষ্ট দিই না। আমার বন্ধু রাশেদ লেখার সময় আমার মনে হলো, এই বইটি যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা, তাই যারা এটি পড়বে, তাদের মুক্তিযুদ্ধের সেই সময়ের একটু সত্যিকারের অনুভূতি পাওয়া দরকার। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অচিন্তনীয় বীরত্ব আছে, আকাশছোঁয়া বিজয় আছে, আর সবচেয়ে বেশি আছে স্বজন হারানোর বুক ভাঙা কষ্ট। তাই এই বইটাতে আমি খানিকটা কষ্ট ঢুকিয়ে দিয়েছি। এমনভাবে লিখেছি যেন যারা পড়ে, তারা মনে একটু কষ্ট পায়। আমি যেটুকু কষ্ট দিতে চেয়েছিলাম, মনে হয় তার থেকে বেশি দেওয়া হয়ে গেছে, সেটি আমি বুঝেছিলাম আমার ছোট মেয়েটির একটা প্রতিক্রিয়া দেখে। তখন আমি মাত্র দেশে ফিরে এসেছি। ছেলেমেয়ে দুজনেই ছোট তখনো। স্বচ্ছন্দে বাংলা পড়তে পারে না। আমাকে তাই মাঝে মাঝে আমার লেখা বই পড়ে শোনাতে হয়। একদিন আমি তাদের আমার বন্ধু রাশেদ পড়ে শোনালাম। পুরোটা শুনে আমার সাত বছরের মেয়েটি কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেল। চুপচাপ বসে থেকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আমরা রাতে ঘুমিয়েছি, সে বিছানায় শুয়ে ঘুমহীন চোখে শুয়ে আছে। গভীর রাতে সে উত্তেজিত গলায় আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। বলল, 'আব্বু, তুমি একটা জিনিস জানো?' আমি বললাম, 'কী?' সে আমাকে বলল, 'বইয়ে লেখা আছে রাশেদকে গুলি করে মেরেছে। কিন্তু তার লাশ তো পাওয়া যায়নি!' আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না সে কী বলতে চাইছে। কিন্তু তার কথায় সায় দিয়ে বললাম, 'না, লাশ পাওয়া যায়নি।' আমার সাত বছরের মেয়ের মুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠল। বলল, 'তার মানে বুঝেছ? আসলে রাশেদের গুলি লাগেনি। সে মারা যায়নি। পানিতে পড়ে সাঁতার দিয়ে চলে গেছে।' আমি অবাক হয়ে আমার ছোট মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বললাম, 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। রাশেদের শরীরে গুলি লাগেনি, সে মারা যায়নি। সাঁতরে সে চলে গেছে, সে বেঁচে আছে।' আমার মেয়ের বুকের ভার নেমে গেল। তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। গভীর একটা প্রশান্তি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে গেল। আমার ছোট মেয়েটির মতো আরও কত শিশুকে না জানি আমি কষ্ট দিয়েছি! সম্ভব হলে সবাইকে বলে আসতাম যে রাশেদ মারা যায়নি। রাশেদরা আসলে কখনো মারা যায় না।

## যেভাবে সিনেমা হলো উপন্যাসটি

নন্দিত কথাসাহিত্যিক মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'আমার বন্ধু রাশেদ' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে। বইটি প্রকাশের পর পরই 'আমার বন্ধু রাশেদ' পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক মোরশেদুল ইসলাম। তখন থেকেই উপন্যাসটি নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরির কথা ভাবছিলেন তিনি। উপন্যাসটি পড়ে এতটা আবেগপ্রবণ হওয়ার মূল কারণ, উপন্যাসের গল্পটি অনেকটাই মিলে যায় তার নিজের জীবনের সঙ্গে। এই উপন্যাসের নায়ক রাশেদ মাত্র এইটে পড়ার সময় ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। মুক্তিযুদ্ধের সময় মোরশেদুল ইসলামও ক্লাস এইটে পড়ছিলেন। ফলে উপন্যাসটি পড়ার সময় নায়কের সঙ্গে নিজের শৈশবকেও কিছুটা মিলিয়ে দেখেন তিনি। রাশেদের সঙ্গে নিজেকে একাকার করে তিনি নিজেও অনুভব করেন যুদ্ধের উত্তেজনা। মনে মনে তিনি সিদ্ধান্ত নেন, এই উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রে রূপ দেবেন। এরপর পেরিয়ে গেল এক যুগেরও বেশি সময়। এই গল্পটি পর্দায় ফুটিয়ে তোলা ছিল বেশ জটিল একটি কাজ। এই কঠিন কাজটির জন্য নিজেকে মানসিকভাবে তৈরি করতে নির্মাতার সময় লেগেছে বেশ। এতে রয়েছে যুদ্ধের কিছু দৃশ্য। বড় একটি চ্যালেঞ্জ মাথায় নিয়ে তিনি লিখে ফেলেন খসড়া পাণ্ডুলিপি। ২০০৮ সালে বরকতুল্লাহ মারুফকে সঙ্গে নিয়ে চূড়ান্ত করেন চিত্রনাট্য। সে বছরই সরকারি অনুদানের জন্য পাণ্ডুলিপি জমা দেন। ২০০৯ সালে ছবিটি সরকারি অনুদান পায়। অনুদান পেলেও ছবিটি তৈরি হতে সময় লেগে যায় প্রায় বছর দুয়েক। নির্মাণে বিলম্ব হওয়ার নেপথ্যে আর্থিক সমস্যাই দায়ী। ২০০৯ সালের জুলাই মাসে দিনাজপুরে শুরু হয় শুটিং। সেখানে ইকবাল হাই স্কুল ও শহরসংলগ্ন এলাকায় ধারণ করা হয় অধিকাংশ দৃশ্য। প্রথম লটের শুটিংয়ের পর অর্থনৈতিক জটিলতায় কিছুদিন থেমেছিল শুটিং। অল্প কিছুদিনের মধ্যে নবোদ্যমে আবারও শুরু হয় শুটিং। দিনাজপুর, মংলা ও ময়মনসিংহে ধারণ করা হয় কিছু যুদ্ধের দৃশ্য। এ ছাড়া আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে ময়মনসিংহ এস কে হাসপাতালে। নির্মাতা জানান, অল্প বাজেটে অধিক কাজ হওয়ায় ছবিটি নির্মাণে বেগ পেতে হয়েছে। ধকলটা শরীরের ওপর দিয়েই গেছে বেশি। শুটিংয়ের সময় সেনাবাহিনী আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। শুটিং শুরুর আগেই পরিচালক সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে শুটিংয়ে সহায়তা চান। রংপুর ক্যান্টনমেন্টের সহযোগিতা সত্যিই মনে রাখার মতো।

## যা বললেন নির্মাতা

সিনেমাটির বিশেষত্ব সম্পর্কে মোরশেদুল ইসলাম বলেন, মুক্তিযুদ্ধে কিশোরদের অংশগ্রহণ নিয়ে রচিত উপন্যাসের সংখ্যা খুবই কম। এ উপন্যাসে বিষয়টি রয়েছে বলেই চলচ্চিত্রায়ণের জন্য এটি বেছে নিয়েছি। এ ছবি দেখে কিশোররা মুক্তিযুদ্ধকে অনুভব করবে এবং অনুপ্রাণিত হবে বলেই আমার ধারণা। আর কিশোরদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ নিয়ে এটিই প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র। সরাসরি বেশকিছু যুদ্ধের দৃশ্য আছে ছবিতে। বিশ্বাসযোগ্যভাবে দৃশ্যগুলো চিত্রায়ণের চেষ্টা করেছি। অনেকের অভিযোগ, আমার চলচ্চিত্র বরাবরই ধীরগতির। এ ছবিতে আমি এ বিষয়টা মাথায় রেখেছি। আমি মনে করি, এ সিনেমাটি বেশ গতিশীল।

## শেষ কথা

চ্যানেল আই মুভিজ ইউটিউব চ্যানেল থেকে সিনেমাটি এখন ঘরে বসেই দেখতে পারবেন দর্শক। দেরি না করে দেখে নিন সিনেমাটি। দেখতে শুরু করলে আরও শেষ না করে উপায় নেই।